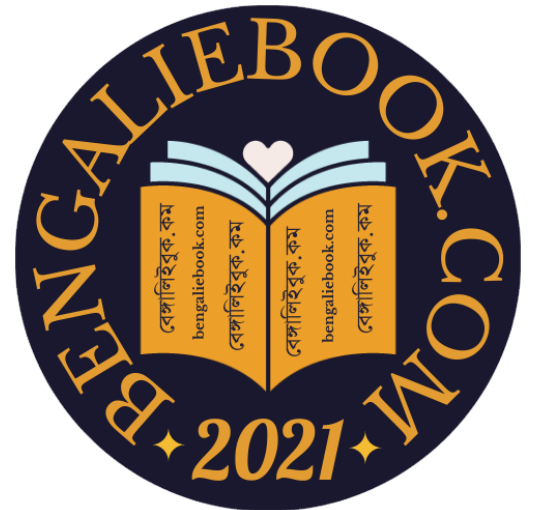


প্রোফেসর শবুঁ

প্রোফেসর শবুঁ ও

গেরিলা

সত্যজিৎ রায়



১২ই অক্টোবর

আজ সকালে উশীর ধার থেকে বেড়িয়ে ফিরছি, এমন সময় পথে আমার প্রতিবেশী অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোকের হাতে বাজারের থলি। বললেন, আপনাকে সবাই একঘরে করবে, জানেন তো। আপনি যে একটি আস্ত শকুনির বাচ্চা ধরে এনে আপনার ল্যাবরেটরিতে রেখেছেন, সে কথা সকলেই জেনে ফেলেছে। আমি বললাম, তা করে তো করবে। আমি তো তা বলে আমার গবেষণা বন্ধ করতে পারি না।

অবিনাশবাবু মাথা নেড়ে বললেন, তা আর কী করে করবেন; কিন্তু তাই বলে আর জিনিস পেলেন না? একেবারে শকুনি?

শকুনির বাচ্চা যে কেন এনেছি তা এরা কেউ জানে না, কারণ আমি কাউকে বলিনি। শকুনির যে আশ্চর্য ভ্রাণশক্তি আছে সেইটে নিয়ে আমি পরীক্ষা করছি। শকুনির দৃষ্টিশক্তিও অবিশ্যি অসাধারণ; কিন্তু টেলিস্কোপ মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে মানুষও তার দৃষ্টিশক্তি অনেকটা বাড়িয়ে নিতে পারে। ভ্রাণশক্তি বাড়ানোর কোনও উপায় কিন্তু আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। সেটা সম্ভব কি না জানার জন্যই আমি শকুনি নিয়ে পরীক্ষা করছি। অবিশ্যি বৈজ্ঞানিকেরা গিনিপিগ জাতীয় প্রাণী নিয়ে যেসব নৃশংস পরীক্ষা করে, সেগুলো আমি মোটেই সমর্থনা করি না। আমি নিজে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে কখনও কোনও প্রাণীহত্যা করিনি। শকুনিটাকেও কাজ হলে ছেড়ে দেব। ওটাকে আমারই অনুরোধে ধরে এনে দিয়েছিল একটি স্থানীয় মুণ্ডা জাতীয় আদিবাসী।

অবিনাশবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়িমুখে হব, এমন সময় ভদ্রলোক একটা অবাস্তর প্রশ্ন করে বসলেন—ভাল কথা-গোরিলা জিনিসটা তো আমরা কলকাতার জু গার্ডেনে দেখিচি, তাই না?

বুঝলাম ভদ্রলোকের জন্তুজানোয়ার সম্বন্ধে জ্ঞান খুবই কম। মুখে বললাম, মনে তো হয় না; কারণ বাঁদর শ্রেণীর ও জন্তুটি ভারতবর্ষের কোনও চিড়িয়াখানায় কোনওদিন ছিল বলে আমার জানা নেই।

খামখা তর্ক করতে অবিনাশবাবুর জুড়ি আর নেই। বললেন, বললেই হল। পষ্ট মনে আছে একটা জাল দিয়ে ঘেরা খোলা জায়গায় বসিয়ে রেখেছে, আমাদের দিকে ফিরে ফিরে মুখভঙ্গি করছে, আর একটা সিগারেট ছুড়ে দিতে দু আঙুলের ফাঁকে ধরে মানুষের মতো—

আমি বাধা না দিয়ে পারলাম না।

—ওটা গেরিলা নয় অবিনাশবাবু, ওটা শিম্পাঞ্জি। বাসস্থান আফ্রিকাই বটে, তবে জাত আলাদা।

ভদ্রলোক চুপসে গেলেন।

—ঠিক কথা। শিম্পাঞ্জিই বটে। ষাটের উপর বয়স হল তো, তাই মেমরিটা মাঝে মাঝে ফেলে করে।

এবার আমি একটা পালটা প্রশ্ন না করে পারলাম না।

আপনার হঠাৎ গিরিডিতে বসে গেরিলার কথা মনে হল কেন?

ভদ্রলোক তাঁর প্রায় তিনদিনের দাড়িওয়ালা গালে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, এই যে কাল কাগজে বেরিয়েছে না-আফ্রিকার কোথায় নাকি এক বৈজ্ঞানিক গেরিলা নিয়ে কী গবেষণা করছেন, আর তাঁর কী জানি বিপদ হয়েছে—তাই আর কী।

আমি যখন কোনও জরুরি গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকি, তখন আমার খবরের কাগজটাগজ আর পড়া হয় না। তাতে আমার কোনও আক্ষেপ নেই, কারণ আমি জানি

যে আমার ল্যাবরেটরিতে যেসব খবর তৈরি হয়, এবং বহুকাল ধরেই হচ্ছে, তার সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোনও খবরের কোনও তুলনাই হয় না। তবুও গেরিলার এই খবরটা সম্পর্কে আমার একটা কৌতূহল হল। জিজ্ঞেস করলাম, বৈজ্ঞানিকের নামটা মনে পড়ছে?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, দূর! আপনার নামই মাঝে মাঝে ভুলে যাই, তার আবার আপনাকে বরং কাগজটা পাঠিয়ে দেব, আপনি নিজেই পড়ে দেখবেন।

বাড়ি ফেরার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অবিনাশবাবুর চাকর বলরাম এসে কাগজটা দিয়ে গেল।

খবরটা পড়ে। ভারী আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বৈজ্ঞানিকট আমার পরিচিত ইংলন্ডবাসী প্রোফেসর জেমস ম্যাসিংহ্যাম। কেমব্রিজে যোবার বক্তৃতা দিতে যাই, সেবার আলাপ হয়েছিল। প্রাণীতত্ত্ববিদ। একটু ছিটগ্রস্ত হলেও, বিশেষ গুণী লোক বলে মনে হয়েছিল।

খবরটা এসেছে আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশের কালেহে শহর থেকে। সেটা এখানে তুলে দিচ্ছি—

অরণ্যে নিখোঁজ

ইংলন্ডের বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ অধ্যাপক জেমস ম্যাসিংহ্যাম গত সাতদিন যাবৎ কঙ্গোর কোনও অরণ্যে নিখোঁজ হয়েছেন বলে জানা গেল। ইনি গত দুমাস কাল যাবৎ উক্ত অঞ্চলে গেরিলা সম্পর্কে গবেষণা করছিলেন, এবং সে সম্পর্কে প্রচুর নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন বলে জানা যায়। স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে অন্তর্হিত অধ্যাপকের অনুসন্ধান চলেছে, তবে তাঁকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যাবে কি না সে বিষয় অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন।

খবরটা পড়ার আধা ঘণ্টার মধ্যেই আমি কেমব্রিজে আমার বন্ধু প্রাণীতত্ত্ববিদ ও পর্যটক প্রোফেসর জুলিয়ান গ্রেগরিকে একটা টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। গ্রেগরিই

ম্যাসিংহামের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেয়। তার কাছ থেকে সঠিক খবরটা পাওয়া যাবে বলে আশা করছি।

১৫ই অক্টোবর

আজ শকুনির বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিলাম। হাণশক্তির রহস্য উদঘাটন হয়েছে বলে মনে হয়। তবে মানুষের পক্ষে এ শক্তি আয়ত্ত করা ভারী কঠিন। কোনও কৃত্রিম উপায়ে এটা সম্ভব বলে মনে হয় না। আমি নিজে আমার গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে একটা ওষুধ তৈরি করছি, এবং সেই ওষুধ দিয়ে একটা ইনজেকশন নিয়েছি। তার ফল এখনও কিছু পাইনি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে এত শিক্ষাদীক্ষা সত্ত্বেও অনেক ব্যাপারে মানুষ জীবজন্তুর চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে।

গ্রেগরির কাছ থেকে এখনও উত্তর পেলাম না। সে কি তা হলে ইংলন্ডে নেই? গেরিলা সংক্রান্ত ঘটনাটা সম্পর্কে এখনও কৌতূহল বোধ করছি। অবিনাশবাবু আজ বললেন যে কঙ্গো থেকে আরেকটা খবরে বলা হয়েছে যে পুলিশ হাল ছেড়ে দিয়েছে এবং ম্যাসিংহ্যাম মৃত বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে।

১৬ই অক্টোবর

এইমাত্র গ্রেগরির টেলিগ্রাম পেলাম। বেশ ঘোরালো ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। ও লিখছে-অ্যাম প্রোসিডিং টু কালেহে স্যাটারডে স্টপ ক্যান ইউ কাম টু স্টপ বিলিভ ম্যাসিংহ্যাম ইজ অ্যালাইভ বাট ইন ট্রাবল স্টপ কেবল ডিসিশন ইমিডিয়েটলি।

অর্থাৎ, শনিবার কালেহে রওনা হচ্ছি : তুমিও আসতে পার কি? আমার বিশ্বাস ম্যাসিংহ্যাম এখনও জীবিত, তবে সম্ভবত সংকটাপন্ন। কী ঠিক করা চটপট তার করে G7pJN3।

আফ্রিকার এক ঈজিপ্ট ছাড়া আর কোনও দেশে এখনও যাওয়া হয়নি আমার। তা ছাড়া বছর খানেক থেকেই লক্ষ করছি যে জীবজন্তু সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা আমার ক্রমেই

বেড়ে চলেছে। ইদানীং পাখির উপরেই জোরটা দিচ্ছিলাম। আমার বাবুইপাখির বাসা নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ নেচার পত্রিকায় ছাপা হয়ে বিশেষ প্রশংসা পেয়েছে। শকুনির উপর কাজটাও শেষ হয়েছে ধরা যায়, এবং সেটা নিয়ে জানাজানি হলে যথারীতি বৈজ্ঞানিক মহলের প্রশংসা পাবই। এই ফাঁকে দিন পনেরোর জন্য কঙ্গোটা ঘুরে এলে মন্দ কী? জীবজন্তুর দিক থেকে বিচার করলে আফ্রিকার মতো দেশ আর নেই; আর মানুষের পূর্বপুরুষ, যে বাঁদর, সেই বাঁদরের সেরা হল গেরিলা, আর সেই গেরিলার বাসস্থান হল আফ্রিকা। আমার পক্ষে এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা ভারী কঠিন। গ্রেগরিকে টেলিগ্রাম করে দেব-সী ইউ ইন কালেহে। ম্যাসিংহ্যামের যা-ই বিপদ হোক না কেন, তাকে উদ্ধার করা আমাদের কর্তব্য।

১৭ই অক্টোবর

আফ্রিকা সফরে যে আমার আবার একজন সঙ্গী জুটে যাবে সে কথা ভাবিনি। অবিশ্যি সেবার সেই রান্সুসে মাছের সন্ধানে সমুদ্রগর্ভে পাড়ি দেবার বেলাও ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছিল। সেবার যিনি সঙ্গ নিয়েছিলেন, এবারও তিনিই নিচ্ছেন; অর্থাৎ, আমার প্রতিবেশী অবৈজ্ঞানিকের রাজা শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

আজ সকালে আমার এখানে এসে আমাকে গোছগাছ করতে দেখেই ভদ্রলোক আঁচ করে নিয়েছিলেন। বললেন, যিদিন কুপমণ্ডুক হয়ে ছিলুম, বেশ ছিল। কিন্তু একবার ভ্রমণ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়েছি, আর কি মশাই চুপচাপ বসে থাকা যায়? আফ্রিকার কথা ছেলেবেলায় সেই কত পড়িচি-সেই জন্তুজানোয়ার, সেই কালো বেঁটে বেঁটে বুনো মানুষ...আপনি যাচ্ছেন সেই দেশে, আর আপনার সঙ্গ নেব না। আমি? খবরটা তো প্রথম আমিই দিই। আপনাকে। আর খরচের কথাই যদি বলেন তো সমুদ্রের তলা থেকে পাওয়া কিছু মোহর এখনও আছে আমার কাছে। আমার খরচ আমি নিজেই বেয়ার করব।

আমি ভদ্রলোককে কত বোঝালাম যে সমুদ্রের তলার চেয়েও আফ্রিকার জঙ্গল অনেক বেশি বিপদসঙ্কুল জায়গা, সেখানে সর্বদা প্রাণটি হাতে নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। অবিনাশবাবু তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, আমার কুষ্ঠীতে আছে আমার আয়ু সেভেনটি এইট। বাঘ সিংহ আমার ধারে কাছেও আসবে না।

অগত্যা রাজি হতে হল। পরশু রওনা। অবিনাশবাবুকে বলে দিয়েছি যে ধুতি পাঞ্জাবি পরে আফ্রিকার বনে চলাফেরা চলবে না; যেখান থেকে হোক তাঁকে এই দুদিনের মধ্যে কোট জোগাড় করে নিতে হবে।

২৩শে অক্টোবর

মধ্য আফ্রিকার বেলজিয়ান কঙ্গো প্রদেশের কালেহে শহর। সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছটা। মিরান্ড হোটেলে আমার ঘরের ব্যালকনিতে বসে ডায়রি লিখছি। দুদিন আগেই এখানে এসে পৌঁছেছি, কিন্তু এর মধ্যে আর লেখার ফুরসত পাইনি।

প্রথমেই বলে রাখি, আফ্রিকা অসাধারণ সুন্দর দেশ। বইয়ে পড়ে এদেশের সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোনও ধারণাই করা যায় না। আমি যেখানে বসে লিখছি, সেখান থেকে পূর্ব দিকে কিভু হ্রদ দেখা যাচ্ছে, আর উত্তর দিকে রুয়েনজেরি পর্বতশৃঙ্গ। জঙ্গলের যেটুকু আভাস পেয়েছি, তার তো কোনও তুলনাই নেই।

অবিশ্যি এইসব উপভোগ করার মতো মনের অবস্থা কতদিন থাকবে জানি না। গ্রেগরির সঙ্গে কথাবাতায় যা বুঝেছি, ভাবনার কারণ আছে অনেক। যা জানলাম তা মোটামুটি এই—

ম্যাসিংহ্যাম গেরিলা সম্পর্কে গবেষণা করছিলেন বেশ অনেকদিন থেকেই। আগে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে গেরিলা নাকি ভারী হিংস্র জানোয়ার, মানুষ দেখলেই আক্রমণ করে। সম্ভবত গেরিলার ভয়ংকর চেহারা থেকেই এ বিশ্বাসের উৎপত্তি। যে সব বৈজ্ঞানিকের উদ্যম ও সাহসের ফলে এ ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়, তাদের মধ্যে

ম্যাসিংহাম একজন। অসীম সাহসের সঙ্গে গেরিলার ডেরার একেবারে কাছাকাছি গিয়ে দিনের পর দিন তাদের হাবভাব লক্ষ করে ম্যাসিংহাম এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন যে বিনা কারণে গেরিলা কখনও কোনও মানুষকে আক্রমণ করে না। বড়জোর নিজের বুকে চাপড় মেরে দুমদাম শব্দ করে এবং মুখ দিয়ে নানারকম আওয়াজ করে মানুষকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

এই তথ্য আবিষ্কার করার পর থেকে ম্যাসিংহামের গেরিলা সম্পর্কে প্রায় নেশা ধরে যায়, এবং প্রতিবছরই দু-তিনবার করে আফ্রিকায় এসে গেরিলা নিয়ে নতুন নতুন গবেষণা করতে থাকে। একটি বাচ্চা গেরিলাকে সে ধরতে পেরেছিল এমন গুজবও শোনা যায়।

এবারেও সে এসেছিল। সেই একই কারণে। কিন্তু অন্যান্যবার তার সঙ্গে বন্দুকধারী শিকারি থাকে, এবার ছিল মাত্র চারজন নিরস্ত্র কুলি। জঙ্গলের ভিতর ক্যাম্প করে কাজ করছিল ম্যাসিংহাম, এবং রোজই কুলিদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে যখন তখন একা একা বেরিয়ে পড়ছিল। মাসদেড়েক ওইভাবে চলার পর একদিন সে নাকি বেরিয়ে আর ফেরেনি। তারপর থেকে দশ দিন ধরে পুলিশের সার্চ পার্টি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ম্যাসিংহামের কোনও সন্ধান পায়নি।

যে ব্যাপারে গ্রেগরির সবচেয়ে বেশি চিন্তা হচ্ছিল সেটা হচ্ছে এই যে আফ্রিকায় আসার কিছুদিন আগে থেকেই ম্যাসিংহামের মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন তার বন্ধুরা লক্ষ করেছিল। তফাতটা শুধু তার স্বভাবে নয়, চেহারাতেও যেন বোঝা যাচ্ছিল। চুলগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি রুক্ষ, চোখদুটো সর্বদাই যেন লাল, আর চাহনিতে একটা দ্রুত অথচ বিরক্ত ভাব। অনেকের ধারণা হয়েছিল যে ম্যাসিংহাম বোধ হয় কোনও আফ্রিকান উদ্ভিজ্জ ড্রাগ জাতীয় জিনিস খাওয়া অভ্যাস করেছে, যার ফলে তার একটা বিশ্রী রকম নেশা হয়। আফ্রিকায় অনেক বুনো লোকেরা এইসব শিকড় বাকল খেয়ে নেশা করে।

কথাটা শুনে আমি বললাম, এসব ড্রাগ খেয়ে তো অনেক মানুষ আত্মহত্যাও করে বলে শুনেছি।

গ্রেগরি বলল, সে তো করেই। কিন্তু ম্যাসিংহাম আত্মহত্যা করেছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। কারণ তার সঙ্গে এবার অনেক জিনিসপত্র ছিল-সেগুলোও পাওয়া যাচ্ছে না।

জিনিসপত্র মানে? বইখাতা ইত্যাদি?

না। তার চেয়েও অনেক বেশি। সে এবার সঙ্গে করে একটি পোর্টেবল গবেষণাগার নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল। আত্মহত্যা করলে সেসব জিনিসগুলো গেল কোথায়? না, শঙ্কু-আমার বিশ্বাস সে বেঁচে আছে, এবং জঙ্গলের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে তার পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে, আর সে পরীক্ষা এমন জাতের যেটা সে কারুর কাছে প্রকাশ করতে চায় না।

আমি বললাম, এত ঢাকাঢাকির কী প্রয়োজন থাকতে পারে সেটা আন্দাজ করতে পারছ?

গ্রেগরি কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, ইদানীং ম্যাসিংহামের একটা অদ্ভুত ধারণা হয়েছিল যে পৃথিবীর যত প্রাণীতত্ত্ববিদ আছে-ইনকুডিং মি-তারা সবাই নাকি তার মৌলিক গবেষণার ফল আত্মসাৎ করে নিজেদের বলে চালাচ্ছে।

ইনকুডিং ইউ? আমি রীতিমতো অবাক হয়ে গেলাম কথাটা শুনে।

গ্রেগরি বললে, হ্যাঁ, তাই। যদিও তার গবেষণা ও আমার গবেষণার বিষয় ও রাস্তা সম্পূর্ণ আলাদা।

তা হলে বলতে হয় ওর সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

গ্রেগরি আশ্চর্যের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু কী ব্রিলিয়েন্ট লোক ছিল বলো তো! আর কী আশ্চর্য সাহস! ওর যদি সত্যিই কোনও অনিষ্ট হয়ে থাকে তা হলে বিজ্ঞানের সমূহ ক্ষতি হবে।

আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম, এসে অবধি গেরিলা চোখে পড়েছে একটাও?

গ্রেগরি বলল, একটিও না।

বলো কী?

নট এ সিঙ্গল ওয়ান। অথচ যেখানে ওদের থাকার কথা সেসব জায়গায় এর মধ্যে আমি দুবার ঘুরে এসেছি। আমি তো ব্যাপারটা কিছুই কুলকিনারা করতে পারছি না। দেখ তুমি যদি পার।

আগামীকাল গ্রেগরির সঙ্গে আমরাও সাফারিতে বেরোব। ওর আশাও ক্ষীণ হয়ে এসেছিল; আমি এসে পড়াতে তবু খানিকটা উদ্যমের সঞ্চার হয়েছে।

অবিনাশবাবু বেশ ভালই আছেন। নিজেই ঘুরেটুরে বেড়াচ্ছেন। পরনে ভাগনের টুইলের শার্ট, গিরিডির অবসরপ্রাপ্ত ব্যারিস্টার সুরেন ঘোষালের খাকি হাফপ্যান্ট, আর মাথায় একটা জীর্ণ খাকি সোলাটুপি-সেটা যে কার কাছ থেকে ধার করে আনা সেটা জানা হয়নি। আজ সকালে দেখি ভদ্রলোক কোথেকে একছড়া কলা কিনে এনেছেন। ভারতবর্ষের বাইরেও যে কলা পাওয়া যায়। সে ধারণা ওঁর ছিল না। বললেন, গেরিলাও তো বাঁদরের জাত, সামনে পড়লে একটা কলা দিয়ে দেখা যাবে খায় কি না।

২৫শে অক্টোবর সকাল সাড়ে ছটা

সকালেই কাজটা সেরে রাখছি।

রহস্য অদ্ভুত ভাবে ঘনিয়ে উঠেছে। ম্যাসিংহ্যাম যে বেঁচে আছে সে প্রমাণ আমরা পেয়েছি। এমনকী এও মনে হতে পারে যে সে সুস্থই আছে-অন্তত শরীরের দিক দিয়ে।

সকালে আমাদের বেরোতে বেরোতে প্রায় সাড়ে আটটা হয়ে গেল। দল বেশি বড় না। আমি, গ্রেগরি, অবিনাশবাবু, এখানকার একজন শিক্ষিত নিগ্রো শিকারি যুবক যোসেফ

কাবালা, ও পাঁচজন বান্টু জাতীয় কুলি। কুলিদের সঙ্গে চলেছে আমাদের খাদ্য ও পানীয়, জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য কাটারি জাতীয় জিনিস, ও বিশ্রামের জন্য ফোন্ডিং চেয়ার, তেরপল, মাটিতে খাটানোর বড় ছাতা ইত্যাদি। কাবালার সঙ্গে বন্দুক ও টোটো রয়েছে, আর আমার কোটের পকেটে রয়েছে আমারই তৈরি অব্যর্থ ব্রক্ষাস্ত্র-অ্যানাইহিলিন পিস্তল। অবিনাশবাবু আবার তাঁর হাতে তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি একটি কাঁঠালিকাঠের লাঠি নিয়েছেন—ভাবখানা যেন তার একটা ঘায়ে তিনি একটি মস্ত গেরিলাকে ধরাশায়ী করতে পারেন। ভদ্রলোকের ঘাটের উপর বয়স আর প্যাকটে চেহারা হলে কী হবে-এমনিতে বেশ শক্ত আছেন। উনি বলেন এককালে নাকি মুণ্ডুর ভাঁজতেন—তবে সেটা ওঁর অন্য অনেক কথার মতোই আমার বিশ্বাস হয় না।

পাহাড়ের গোড়া অবধি জিপে গিয়ে সেখান থেকে পায়ে হেঁটে জঙ্গলের ভিতর ঢুকলাম আমরা। এই জঙ্গল পাহাড়ের গা বেয়ে ক্রমশ উপর দিকে উঠেছে। আফ্রিকার দুজাতের গেরিলার মধ্যে একটা-অর্থাৎ যাকে বলে মাউন্টেন গেরিলা-এই জঙ্গলেই পাওয়া যায়। অন্য জাতটা থাকে সমতলভূমিতে। ম্যাসিংহাম পাহাড়ের জঙ্গলেই তাঁর গবেষণা চালাচ্ছিলেন। আমাদের আজকের গন্তব্যস্থল হচ্ছে ম্যাসিংহাম যেখানে ক্যাম্প ফেলেছিলেন সেই জায়গা। গ্রেগরি এর আগেও একবার গেছে সেখানে, কিন্তু কিছুই পায়নি। নেহাৎ আমার অনুরোধেই সে দ্বিতীয়বার সেখানে চলেছে।

ডেভিড লিভিংস্টোন তাঁর লেখায়। এইসব জঙ্গলের বর্ণনা দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, এসব জঙ্গল এত গভীর এবং গাছের পাতা এত ঘন যে ঠিক মাথার উপর সূর্য থাকলেও, পাতা ভেদ করে দু-একটা পেনসিল অফ লাইট ছাড়া আর কিছুই মাটিতে পৌঁছাতে পারে না। কথাটা যে কতদূর সত্যি তা এবার বুঝতে পারলাম।

আমাদের ভারতীয়দের ধারণা যে বট-অশ্বখ গাছই বুঝি পৃথিবীর সবচেয়ে জাঁদরেল গাছ। এখানের কয়েকটা গাছ দেখলে তাদের সে গর্ব খর্ব হয়ে যায়। বাওবাব বলে এক রকম গাছ আছে যার গুড়ি মাঝে মাঝে এত চওড়া হয় যে, দশ জন লোক পরস্পরের হাত ধরে গাছটাকে ঘিরে ধরলেও তার বেড়ি পাওয়া যায় না। অবিশ্যি যে জঙ্গলের মধ্যে

দিয়ে আমরা চলেছি তাতে বাওবাব গাছ নেই। এ জঙ্গলের গাছের মাহাত্ম্য হচ্ছে দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে নয়। এক একটা সিডার ও আবলুশ গাছ প্রায় দুশো ফুট উঁচু। অবিশ্যি যতই উপরে উঠছি ততই বেশি করে পাইন বা ফার জাতীয় পাহাড়ি গাছ চোখে পড়ছে। এছাড়া লতাপাতা, আর্কিড ও ফার্নের তো কথাই নেই।

জন্তু জানোয়ার এখনও বিশেষ চোখে পড়েনি। বাঁদরের মধ্যে দুটি বেবুন চোখে পড়েছে, আর অন্য জানোয়ারের মধ্যে একটি উড়ন্ত কাঠবেড়ালি। আশ্চর্য জিনিস। এটি। ভারতীয় কাঠবেড়ালির প্রায় দ্বিগুণ সাইজ, গায়ের রং বাদামি, আর শরীরের দুদিকে পায়ের সঙ্গে

লাগানো দুটি ডানা। পা দুটো ফাঁক করে গাছের ডাল থেকে লাফ দিয়ে দিব্যি চলে যায় □ □: □

এগাছ থেকে ওগাছে। ফ্লাইং স্কুইরেল দেখে অবিনাশবাবু বললেন, ষাট বছর বয়সে জঙ্গলে ঘুরে যা এডুকেশন হচ্ছে, ইস্কুলে কলেজে মানিবই মুখস্থ করে তার সিকি অংশও হয়নি। এখানকার বাঘ ভাল্লুকও কি ওড়ে নাকি মশাই?

প্রায় সাড়ে তিন মাইল হাঁটার পর প্রথম গেরিলার চিহ্ন চোখে পড়ল। পুরুষ গেরিলারা গাছের ডাল ভেঙে গাছেরই উপর একরকম মাচা তৈরি করে। স্ত্রী গেরিলা বাচ্চা নিয়ে সেই মাচার উপর রাত কাটায়, আর পুরুষটা নীচে মাটিতে থেকে পাহারা দেয়। এটা আমার জানা ছিল, এবং এইরকম একটা মাচা হঠাৎ আমার চোখে পড়ল।

গ্রেগরি বলল, এই মাচাটা আমরা এর আগের দিনও দেখেছি। তবে গেরিলারা এক মাচায় এক রাতের বেশি থাকে না। কাজেই এ মাচাটা যখন বেশ কিছু দিনের পুরনো, তখন কাছাকাছির মধ্যে গেরিলা থাকবে এমন কোনও কথা নেই।

একটা গন্ধ মিনিটখানেক থেকে আমার নাকে আসছিল, গ্রেগরিকে সেটার কথা বলতে সে যেন কেমন অবাক হয়ে গেল। সে বলল, কোনও বিশেষ গন্ধের কথা বলছি কি? আমি তো এক গাছপালার গন্ধ আর ভিজে মাটির গন্ধ ছাড়া কিছু পাচ্ছি না।

আমি মাচার দিকে এগিয়ে গেলাম। গন্ধ দ্বিগুণ তীব্র হয়ে উঠল। এ গন্ধের সঙ্গে কি গেরিলার কোনও সম্পর্ক আছে? আমার ইনজেকশন কি তা হলে এতদিনে কাজ করতে শুরু করল? গন্ধটা যে বুন্দো সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, আর এমন গন্ধ এর আগে আমি কক্ষনও পাইনি।

গ্রেগরিকে এ বিষয় আর কিছু না বলে এগিয়ে চললাম। মিনিট দিশেকের মধ্যে গন্ধটা মিলিয়ে এল। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার সেটা আসতে শুরু করল। অবিনাশবাবুকে বাংলায় বললাম, আশেপাশের গাছের দিকে একটু চোখ রাখবেন তো-ওইরকম মাচা আরও দেখা যায় কি না।

কিছুদূর যাবার পরেই আবার আমারই চোখে পড়ল আরেকটা গেরিলার মাচা। এবার আর আমার মনে কোনও সন্দেহ রইল না যে আমার ইনজেকশনের ফলে আমি প্রায় আধ মাইল দূর থেকে গেরিলার মাচার অস্তিত্ব বুঝতে পারছি।

দুপুর আড়াইটে নাগাদ আমরা ম্যাসিংহ্যামের ক্যাম্পের জায়গায় পৌঁছোলাম। মস্ত মস্ত ফার আর বাদামগাছে ঘেরা একটা পরিষ্কার, খোলা, প্রায়-সমতল জায়গা। জমিতে দুজায়গায় আগুন জ্বালানোর চিহ্ন, আর এখানে সেখানে তাঁবুর খুঁটির গর্ত রয়েছে। উত্তর দিকটা পাহাড়ের খাড়াই, আর দক্ষিণে ঢাল নেমে সমতলভূমির দিকে চলে গেছে। সকলেই বেশ ক্লান্তি অনুভব করছিলাম, তাই কাবালা কুলিদের বলল মাটিতে বসবার বন্দোবস্ত করে দিতে। দুপুরের খাওয়াটাও এখানেই সেরে নিতে হবে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিশ্রামের বন্দোবস্ত হয়ে গেল। একটা ক্যাম্পচেয়ারে বসে স্যান্ডউইচে কামড় দিতে গিয়ে লক্ষ করলাম অবিনাশবাবু আমাদের সঙ্গে না বসে একটু দূরে পায়চারি করছেন। কারণটা বোঝা আমার পক্ষে কঠিন হল না। পাছে গ্রেগরি তাঁকে

কোনও প্রশ্ন করে বসে, এবং ইংরিজিতে তার উত্তর দিতে হয়, সেই আশঙ্কাতেই তিনি দূরে দূরে রয়েছেন। অবিনাশবাবুর ইংরিজি বলার ক্ষমতা ইয়েস নো ভেরি গুডের বেশি এগোয় না; অথচ সব প্রশ্নের উত্তর তো আর এই তিনটি কথায় দেওয়া চলে না।

স্যান্ডউইচ খাওয়া সেরে চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে দূরের গাছপালা দেখছি, এমন সময় অবিনাশবাবুর গলা পেলাম

ও মশাই-এটা কী একবার দেখে যান তো।

ভদ্রলোক দেখি একটা পাইনগাছের গুড়ির দিকে ঝুকে পড়ে কী যেন দেখছেন। গ্রেগরি আর আমি এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি গাছের গুড়িতে ছুরি দিয়ে খোদাই করা এক লাইন ইংরিজি লেখা। সেটা অনুবাদ করলে এই দাঁড়ায়—

তোমরা মুখ। যদি বাঁচতে চাও তো ফিরে যাও।

খোদাইয়ের নমুনা দেখে মনে হল সেটা টাটকা। আমরা লেখাটা পড়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। এটা যে একটা আশ্চর্য আবিষ্কার সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কথা বললেন প্রথম অবিনাশবাবু, এবং তাঁর স্বরে রীতিমতো বিরক্তির ভাব—

আমাদের সবাইকে মূর্খ বলছে! লোকটার ভারী আস্পর্ধা তো!

গ্রেগরি বলল, এ লেখা কিন্তু এর আগের দিন ছিল না। আমরা পরশুই এখানে এসেছিলাম। অর্থাৎ এটা লেখা হয়েছে গতকাল। তার মানে ম্যাসিংহ্যাম কাল আবার এখানে এসেছিল।

এটা যে ম্যাসিংহ্যামেরই লেখা, এবং এটা যে তার অনুসন্ধানকারীদের উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছে, সে বিষয়ে আমার মনেও কোনও সন্দেহ ছিল না।

গ্রেগরি এবার অবিনাশবাবুর দিকে ফিরে বলল, এ মোস্ট ইউজফুল ডিসকভারি।
কনগ্র্যাচুলেশনস

অবিনাশবাবু বললেন, ভেরি গুড।

আমি মনে মনে বললাম, ভেরি গুড তো বটেই। এই লেখা থেকেই অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল যে ম্যাসিংহ্যাম মরেনি। সে দস্তুর মতো বেঁচে আছে, দিব্যি তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, এবং সে কাজে বাধা পড়ে সেটা সে মোটেই চাইছে না। কিন্তু সে কাজটা যে কী, এবং কোথায় সে আত্মগোপন করে রয়েছে, সেটা এখনও রহস্য।

আমরা হোটেলে ফিরলাম প্রায় রাত সাড়ে দশটায়। ফেরার পথেই স্থির করেছিলাম যে আমাদেরও জঙ্গলের ভিতর তাঁবু ফেলে কাজ চালাতে হবে।

ম্যাসিংহ্যাম শাসিয়েছে যে তার অনুসন্ধান যে করবে তার মৃত্যু অনিবার্য। সে জানে না সে একথাটা লিখে কতবড় ভুল করেছে। ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুকে এমন হুমকিতে যে হটানো যায় না, সে কথা তো আর ম্যাসিংহ্যাম জানে না। ভাবনা ছিল এক অবিনাশবাবুকে নিয়ে, কিন্তু তিনিও দেখছি বারবার বলছেন, লোকটার দস্তট্টা একটু খেতলে দেওয়া দরকার।

২৫শে অক্টোবর দুপুর দেড়টা

আমরা কিছুক্ষণ হল জঙ্গলে এসে ক্যাম্প ফেলেছি। ম্যাসিংহ্যাম যেখানে ক্যাম্প ফেলেছিল, সেখানেই। একটু বিশ্রাম করে দুপুরের খাওয়া সেরে আবার বেরোব। আজ মেঘলা করে রয়েছে বলে জঙ্গলের ভিতরে আরও অন্ধকার। এখানে আমাদের দেশের মতোই এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বৃষ্টি হয়। তবে এখন বৃষ্টি না হওয়াই ভাল; হলে আমাদের কাজের অনেক ব্যাঘাত হবে।

আজ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে একটা ভারী আশ্চর্য জিনিস লক্ষ করেছি; সেটা এই ফাঁকে ডায়েরিতে লিখে রাখি। কাল কয়েকটা বেবুন আর লেমুর ছাড়া

বানরজাতীয় আর কিছুই চোখে পড়েনি, আর আজ সকাল থেকে এই চার ঘণ্টার মধ্যে সাত রকমের বাঁদর দেখেছি। আর আশ্চর্য এই যে তাদের সকলেরই হাবভাব যেন ঠিক একই রকম; মনে হয় তারা সবাই যেন গভীর বন থেকে রীতিমতো ভয় পেয়ে বাইরের দিকে চলে আসছে। সে এক দৃশ্য! আমাদের মাথার উপরের গাছের পাতা আর লতাগুলো যেন একমুহূর্ত স্থির থাকতে পারছে না। সাঁই সাঁই সাঁই শব্দে লেমুর ম্যানড্রিল বেবুন শিম্পাঞ্জি সব পালিয়ে চলেছে মুখ দিয়ে নানারকম ভয়ের শব্দ করতে করতে। আমাদের দিকে তাদের ভুঙ্কেপও নেই। এমন কেন ঘটছে তা এখনও ঠাहर করতে পারিনি। গ্রেগরি এর আগে তিনবার আফ্রিকার জঙ্গলে এসেছে, কিন্তু এমন দৃশ্য সে কখনও দেখেনি। এই যে বসে বসে ডায়রি লিখছি, এখনও তাদের চিৎকার চেচামেচি শুনতে পাচ্ছি। এই ঘটনাও কি ম্যাসিংহ্যামের সঙ্গে জড়িত?

নিজেকে ভারী ব্যর্থ বলে মনে হয়েছে। এখনও পর্যন্ত একেবারে বোকা বনে আছি। অন্তত এটুকু যদি জানা যেত যে ম্যাসিংহ্যাম ঠিক কী কাজটা করছে, তা হলেও মনে হয় অনেক রহস্যের কারণ বেরিয়ে পড়ত।

২৬শে অক্টোবর ভোর পাঁচটা

ভোরের আলো এখনও ভাল করে ফোটেনি। তাঁবুতে বসেপেনলাইটের আলোতে আমার ডায়রি লিখছি। যে অদ্ভুত ভয়াবহ ঘটনাটা ঘটে গেল, সেটা এইবেলা লিখে না। রাখলে পরে আর কখন সময় পাব জানি না। সত্যি কথা বলতে কী, পাইনগাছের গুড়িতে লেখা হুমকিটা আর অগ্রাহ্য করতে পারছি না। প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে পারব কি না সে বিষয়ও সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

কাল দুপুরে লাঞ্চে পর আমরা আবার উত্তর-পূর্বদিকের রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করলাম। মাইলখানেক যাবার পর লক্ষ করলাম। বাঁদরের গোলমালটা কমে এসেছে। গ্রেগরি বলল, মনে হচ্ছে গেরিলা ছাড়া যত বাঁদর ছিল সব বন ছেড়ে বাইরের দিকে পালিয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কারণ কিছু বুঝলে?

গ্রেগরি ভুকুটি করে বলল, ভয় পেয়েছে এটুকু বুঝলাম, তার বেশি নয়।

আমি প্রায় ঠাট্টার সুরেই বললাম, আমাদের দেশে যদি কোথাও একটা কাক মরে, তা হলে সে তল্লাটে যত কাক আছে সব কটা একজোটে ভীষণ চিৎকার চেচামেচি শুরু করে। এটাও কি সেই ধরনের ব্যাপার নাকি?

গ্রেগরি চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ থেকেই ওর মধ্যে একটা অবসন্ন ভাব লক্ষ্য করছি, যেটা বোধ হয়। শারীরিক নয়, মানসিক। গ্রেগরির বয়স পঞ্চাশের উপর হলেও রীতিমতো স্বাস্থ্যবান লোক-ইয়ং বয়সে বিজ্ঞানের সঙ্গে খেলাধুলোও করেছে। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কী হয়েছে বলে তো?

গ্রেগরি মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে হাঁটতে হাঁটতে বলল, আমার মনে একটা সন্দেহ জাগছে। যেটা এখন প্রকাশ করলে তুমি হাসবে, কিন্তু সেটা যদি সত্যি হয়, একমাত্র তা হলেই এইসব অদ্ভুত ঘটনাগুলোর একটা কারণ পাওয়া যায়। অথচ তাই যদি হয়, তা হলে তো....উঃ!-

গ্রেগরি শিউরে উঠে চুপ করে গেল। আমিও তাকে আর প্রশ্ন করে বিরক্ত করলাম না। আমার নিজের সন্দেহটাও ডায়েরিতে প্রকাশ করার সময় আসেনি। মনে হয় গ্রেগরি ও আমি এই পথে চিন্তা করে চলেছি-কারণ বিজ্ঞানের কী অসীম ক্ষমতা সেটা আমরা দুজনেই জানি।

কিছুক্ষণ থেকেই অনুভব করছিলাম যে আমরা নীচের দিকে চলেছি। এবার দেখলাম আমাদের সামনে একটা নালা পড়েছে। একটা ওকাপি জল খাচ্ছিল, আমাদের দেখেই পালিয়ে গেল। নালার জল গভীর নয়, কাজেই সেটা হেঁটে পার হতে আমাদের কোনও কষ্ট হল না।

নালা পেরিয়ে দশ পা যেতে না যেতেই একটা পরিচিত তীব্র গন্ধ এসে আমার নাকে প্রবেশ করল। আমি জানি সে গন্ধ আমি ছাড়া আর কেউ পায়নি। কাউকে কিছু না বলে হেঁটে চললাম।

এবার যেটা চোখে পড়ল সেটা গাছের উপরে মচা নয়-ভিজে মাটিতে গেরিলার পায়ের ছাপ। একটা নয়; দেখে মনে হয় সম্ভবত পঞ্চাশটা ছোটবড় গেরিলা বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে সেখানে ঘোরাফেরা করেছে। কিন্তু কেন?

কাবালা দেখি তার বন্দুক উঁচিয়ে তৈরি; বুঝলাম সে রীতিমতো ঘাবড়ে গেছে। সে চাপা স্বরে বলল, একসঙ্গে এত গেরিলার পায়ের ছাপ আমি এর আগে কখনও দেখিনি। ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগছে না। যখন থেকে বাঁদরদের পালাতে দেখেছি, তখন থেকেই খটকা লাগতে শুরু করেছে।

আমাদের বান্টু কুলিদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করছিলাম, কাবালাকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, ওরা আর এগোতে চাইছে না।

আমি বললাম, কেন? ওদের কি ধারণা সামনে গেরিলার দল রয়েছে?

কাবালা বলল, হ্যাঁ।

আমার নাকের গন্ধ কিন্তু বলছিল যে তারা কাছাকাছির মধ্যে নেই-কিন্তু সে কথা তো আর ওদের বললে বিশ্বাস করবে না!

এর মধ্যে গ্রেগরি হঠাৎ বলে উঠল, শঙ্কু, একবার ওপরের দিকে চেয়ে দেখো।

মাথা তুলে এক আশ্চর্য জিনিস দেখলাম। চারিদিকের গাছের ডাল ভাঙা। গুড়িগুলো রয়েছে, কিন্তু ডালপালাগুলো সব কারা যেন ভেঙে সাফ করে নিয়ে গেছে।

গ্রেগরির দিকে চেয়ে দেখি তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চাপা গলায় সে বলল,
লেটুস গো ব্যাক, শঙ্কু!

কোথায়?

আপাতত ক্যাম্পে ফিরে যাই চলো। আমাকে একটু চুপচাপ বসে ভাবতে হবে।

তোমার কি মনে হয় ডালগুলো গেরিলারা ভেঙেছে?

তা ছাড়া আর কী। সম্প্রতি এমন ঝড় এখানে হয়নি যাতে ওইভাবে গাছের ডাল
ভাঙবে। আর ওগুলোকে যে কাটা হয়নি। সে তো দেখেই বুঝতে পারছি।

সত্যি বলতে কী, আমারও ওই একই সন্দেহ হয়েছিল। যে গেরিলার পায়ের ছাপ
মাটিতে দেখছি, তারাই গাছের ডালগুলো ভেঙেছে।

গ্রেগরির কথামতো ক্যাম্পে ফিরে আসতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। গরম কোকো খেয়ে
ক্লান্তি দূর করে গ্রেগরির ক্যাম্পের বাইরে বসে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কী ভাবিছ
বলে তো?

গ্রেগরি তার শান্ত অথচ ভীত চোখদুটো আমার দিকে ফিরিয়ে বলল, আমার মনে
হয় না। আমরা ম্যাসিংহ্যামের সঙ্গে যুঝতে পারব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে তার বৈজ্ঞানিক
বুদ্ধি এক নৃশংস কাজে ব্যবহার করতে চলেছে।

আমি দৃঢ়স্বরে বললাম, তা হলে আমাদের কর্তব্য তাকে বাধা দেওয়া।

গ্রেগরি বলল, জানি! কিন্তু সে কাজটা করতে যে সামর্থ্যের প্রয়োজন সেটা আমাদের
নেই! সুতরাং আমাদের পরাজয় অনিবার্য।

আমি বুঝতে পারলাম যে, এ অবস্থায় গ্রেগরির মনে উৎসাহ বা আশার সঞ্চার করা প্রায় অসম্ভব। মুখে বললাম, ঠিক আছে। এখন তো বিশ্রাম করা যাক-কাল সকালে দুজনের বুদ্ধি একজোট করলে একটা কোনও রাস্তা বেরোবে না, এটা আমি বিশ্বাস করি না।

সন্ধ্যা থাকতে সকলেই টিনের খাবারে ডিনার সেরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তিনটি ক্যাম্পের একটিতে আমি আর অবিনাশবাবু একটিতে গ্রেগরি ও একটিতে কাবালা। বান্টু কুলিগুলো বাইরে শোয়-তারা এখন আগুন জ্বলিয়ে জটলা করছে। একজন আবার গান শুরু করল। সেই একঘেয়ে গান শুনতে শুনতেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

মাঝরাত্রে কোনও এক সময়ে ঘুমটা ভাঙল অবিনাশবাবুর ঠেলাতে, আর ভাঙতেই কানের খুব কাছে তাঁর ফিসফিসে ভয়াবহ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম-

ও মশাই!-শিম্পাঞ্জি! শিম্পাঞ্জি।

শিম্পাঞ্জি? আমি সটান উঠে পড়লাম। কোথায় দেখলেন? কখন?

এই তো, দশ মিনিটও হয়নি। এতক্ষণ গলাটা শুকিয়ে ছিল তাই কথা বলতে পারিনি।

কী হল ঠিক করে বলুন তো।

আরো মশাই, এরকম মাটিতে বিছানা পেতে তাঁবুর ভেতর শুয়ে তো অভ্যেস নেই-তাই ভাল ঘুম হচ্ছিল না। এমনতেই। কিছুক্ষণ আগে ভাবলুম বাইরে গিয়ে একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়ে আসি। কনুইয়ে ভর করে কাঁধদুটোকে একটু তুলেছি, এমন সময় দেখি তাঁবুর দরজা ফাঁক করে ভিতরে উঁকি মারছে।

কী যে উঁকি মেরেছে সেটা আমার বুঝতে বাকি নেই, কারণ তাঁবুর ভেতরটা আমার সেই গন্ধ মেশালে যেমন হয়, কতকটা সেই রকম গন্ধ।

অবিনাশবাবু বলে চলেছেন—

কলকাতার চিড়িয়াখানায় যেরকম দেখেছি ঠিক সেরকম নয়। সাইজে অনেক বড়, বিরীট চওড়া কাঁধ, আর অর্ধেক মুখ জুড়ে দুই নাকের ফুটো, আর হাত দুটো—

আমি অবিনাশবাবুর কথা শেষ হবার আগেই ক্যাম্পের বাইরে চলে এসেছি, হাতে আমার পিস্তল। আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে চারিদিকে চাঁদের আলো থই থই করছে, সাদা তাঁবুগুলো সেই আলোয় ঝলমঝল করছে। জঙ্গল নিঝুম নিস্তব্ধ। বান্টু কুলিগুলো আগুনের ধারে পড়ে ঘুমোচ্ছে। অন্য তাঁবু দুটিতেও মনে হল দুজনেই ঘুমোচ্ছে। তবু গ্রেগরিকে খবর দেওয়া দরকার মনে করে তার তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেলাম।

তাঁবুর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দুবার তার নাম ধরে ডেকেও সাড়া না পেয়ে ভারী আশ্চর্য লাগল—কারণ আমি জানি গ্রেগরির ঘুম খুব পাতলা। তবে সে উঠছে না কেন?

দরজা ফাঁক করে ভেতরে ঢুকেই চমকে উঠলাম।

গ্রেগরির বিছানা খালি পড়ে আছে। বালিশ চাদর সবই রয়েছে, এবং সেগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এখন আর সেখানে কেউ নেই।

বালিশে হাত দিয়ে দেখলাম গরম; অর্থাৎ অল্পক্ষণ আগেও সে ছিল।

অবিনাশবাবু ধরা গলায় বললেন,—লোকটা গেল কোথায়?

আমি বললাম, গেরিলার কবলে।

একটি গেরিলা এসে প্রথমে আমাদের ক্যাম্পে উঁকি মেরেছে। তারপর গ্রেগরির ক্যাম্পে ঢুকে তাকে কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে গেছে—কোথায়, তা এখনও জানি না।

কাবালার গলা শুনতে পাচ্ছি। ওকে ব্যাপারটা বলি। ওর উপর এখন অনেকখানি ভরসা রাখতে হবে।

২৬শে অক্টোবর

একটা ভয় ছিল যে কাবালা বেগতিক দেখে আমাদের পরিত্যাগ করবে। কিন্তু তা তো হয়ইনি, বরং সে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লেগেছে।

আজ সকাল সাতটায় আমরা ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়েছি। দিনের আলো পরিষ্কার হলেই দেখেছিলাম তাঁবুর বাইরে গেরিলার পায়ে ছাপ। সেই ছাপ ধরে প্রায় দু মাইল পথ এসেছি আমরা। আশ্চর্য এই যে ছাপটা আমাদের পাহাড়ের জঙ্গল ছেড়ে সমতল ভূমির জঙ্গলের দিকে নিয়ে চলেছে। নিয়মমতো এদিকে মাউন্টেন গেরিলা থাকার কথাই নয়, এবং এদিকটায় ম্যাসিংহ্যামকে খোঁজাই হয়নি। একটা নালা পেরিয়ে উলটো দিকে এসে ছাপটা আর খুঁজে পাইনি। তার একটা কারণ হতে পারে এই যে এদিকের জমিটা আরও অনেক বেশি শুকনো আর পাথুরে। সামনে একটা টিলার মতো রয়েছে, সেটার নীচে আমরা বিশ্রামের জন্য বসেছি। আজ আমরা প্রথম থেকেই ঠিক করেছি যে আর পিছনে ফিরব না, যেখানে সন্ধে হবে সেখানেই ক্যাম্প ফেলব। কুলিগুলো এখনও রয়েছে। গ্রেগরির অন্তর্ধানের ফলে তারা খুঁতখুঁত করতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু বেশি করে বকশিস দেওয়াতে তারা রয়ে গেছে।

অবিনাশবাবুর গলা পাচ্ছি। আমাকেই ডাকছেন। দেখি কী হল।

২৭শে অক্টোবর

এমন বিভীষিকাময়, অথচ এমন রোমাঞ্চকর ঘটনার বিবরণ লিখতে যে ভাষার দরকার হয় সেটা আমার জানা নেই। কাল বিকেল থেকে পর পর যা ঘটেছে তা সহজ ভাবে লিখে যাব, তাতে কতটা বোঝাতে পারব জানি না।

কাল ডায়রি লিখতে লিখতে অবিনাশবাবুর ডাক শুনে উঠে গিয়ে দেখি তিনি টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর দৃষ্টি উলটো দিকে। কী জানি একটা দেখতে পেয়ে ভদ্রলোক তারস্বরে আমার নাম ধরে ডাকছেন। আমায় দেখেই বললেন, শিগগির উঠে আসুন।

কাবালা নালায় গিয়েছিল হাত মুখ ধুতে—এখনও ফেরেনি। আমি একাই গিয়ে টিলার উপরে উঠলাম। তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই অবিনাশবাবু কাঁপা গলায় বললেন, কুণ্ঠী বোধ হয় মিলল না। তারপর তাঁর কম্পমান ডান হাতটা তুলে দক্ষিণের সমতলভূমির জঙ্গলের দিকে নির্দেশ করলেন। যা দেখলাম তাতে আমারও আতঙ্ক হওয়া উচিত, কিন্তু দৃশ্যটা এতই অদ্ভুত ও অভূতপূর্ব যে ভয় না পেয়ে সম্মোহিতের মতো চেয়ে রইলাম।

আন্দাজ প্রায় একশো গজ দূর থেকে একটা গেরিলার দল আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তারা সংখ্যায় কত হবে জানি না, তবে শাখানেকের কম নয়। গাছ থাকার জন্য তাদের সবাইকে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে না, আর প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে তারা যেন সংখ্যায় আরও বেড়ে যাচ্ছে। কাবালাও এরমধ্যে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে; সে শুধু বলল, কুলিগুলো পালিয়েছে। আমাদের দুজনের কাছেই অস্ত্র রয়েছে, কিন্তু সে অস্ত্র এই গেরিলাবাহিনীর সামনে কিছুই না।

এত বিপদেও চোখের সামনে মৃত্যুকে এগিয়ে আসতে দেখেও, পালাবার কথা চিন্তা করতে পারলাম না। অবিনাশবাবু মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছেন, আর অস্ফুটস্বরে কেবল বলছেন, মা, মা মাগো! কাবালা ফিসফিস করে বলল, তুমি যা করবে, আমিও তাই। আমি কথা না বলে হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিলাম—যা থাকে কপালে-দাঁড়িয়ে থাকব।

গেরিলাগুলো পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে। তাদের গায়ের গন্ধে আমার নাক প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। কোনওদিকে ভূক্ষেপ না করে এগিয়ে আসছে তারা। এবার লক্ষ করলাম, কোনও কোনও গেরিলা আবার সঙ্গে শিকার নিয়ে চলেছে; কোনওটার কাঁধে হরিণ, কোনওটার কাঁধে বুনো গুয়োর, আবার দুটোর হাতে দেখলাম ভেড়া। এসব জিনিস কিন্তু গেরিলার খাদ্য নয়; এরা নিরামিষাশী-ফলমূল খেয়ে থাকে।

কাবালা হঠাৎ সামনের গেরিলাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওটার মাথায় কী বলো তো?

ওই গেরিলাটাই বোধ হয় দলপতি-এবং গেরিলা যে এত বড় হয় সেটা আমার ধারণাই ছিল না। দেখলাম তার মাথায় কী যেন একটা জিনিস রোদের আলোয় চকচক করছে।

ক্রমে গেরিলাগুলো দশ গজের মধ্যে এসে পড়ল। ঠিক মনে হয় একটা কালো লোমশ অরণ্য আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করে ভারী অদ্ভুত লাগল। সেটা হল তাদের চোখের ভাব। কেমন যেন একটা থমকানো মুহ্যমান ভাব। যন্ত্রচালিতের মতো দৃষ্টিহীন ভাবে যেন এগিয়ে আসছে তারা। একটা গেরিলা একটা পাথরের সঙ্গে ঠোঁকর খেল; কিন্তু তাতে কোনও ভুক্ষেপ নেই। সামলে নিয়ে আবার এগিয়ে আসতে লাগল।

অবিনাশবাবু বোধ হয় অজ্ঞান। কাবালাও হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। ...

আমরা মরিনি। আমাদের পাশ দিয়ে গা ঘেঁষে গেরিলার দল চলে গেছে। যখন আমাদের সঙ্গে ধাক্কা লাগার উপক্রম হয়েছে, তখন পাশে সরে গেছি। অবিনাশবাবুকে কাবালা কোলে তুলে নিয়েছিল। কারও কোনও অনিষ্ট হয়নি, কেউ জখম হয়নি। এমনকী একথাও মনে হয়েছে যে গেরিলাগুলো যেন আমাদের দেখতেই পায়নি। চোখ থেকেও যেন তারা দৃষ্টিহীন, এবং দৃষ্টিহীন ভাবেই তারা গন্তব্য স্থানের দিকে এগিয়ে গেছে।

গেরিলার পায়ের আর নিশ্বাসের শব্দ মিলিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পর অবিনাশবাবু জ্ঞান ফিরে পেলেন। আমিও টিলার উপর বসে পড়েছিলাম। এমন একটা অভিজ্ঞতার পর আর পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। অবিনাশবাবুই প্রথম মুখ খুললেন। বললেন, আমার কুষ্ঠীর জোরটা দেখলেন?

কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু অবিনাশবাবুর কথায় কান দেবার সময় নেই আমার। আজ প্রথম আমি অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখতে পেয়েছি। এখন আমাদের

রাস্তা একটাই-গেরিলা যে পথে গেছে সেই পথে যাওয়া। তবে আজ আর নয়; আজ বেলা হয়ে গেছে। কাল ভোরে রওনা হব। অনেক পায়ের ছাপা পড়েছে মাটিতে। অনায়াসে সেই ছাপ অনুসরণ করে চলতে পারব। আমার বিশ্বাস ওই পায়ের ছাপাই আমাদের ম্যাসিংহ্যামের সন্ধান দেবে। আমি জানি আমাদের অভিযান চূড়ান্ত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। জয়-পরাজয় মরণ-বাঁচন সবই কালকের মধ্যেই নির্ধারিত হয়ে যাবে।

২৭শে অক্টোবর, রাত ২টা

এর মধ্যেই যে আবার ডায়রি লিখতে হবে তা ভাবিনি। কিন্তু এসব ঘটনা টাটকা লিখে ফেলাই ভাল। এই প্রথম আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তল ব্যবহার করতে হল। এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। ঘটনাটা বলি।

গেরিলাদের দল চলে যাবার এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা নিজেরাই টিলার পাশে ক্যাম্প ফেলে রাত্রিযাপনের আয়োজন করে নিয়েছিলাম। এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর রাত্রে ঘুম হবে না মনে করে আমরা তিনজনেই একটা করে আমার তৈরি সমনোলিন বড়ি খেয়ে নিয়েছিলাম। রিস্টওয়াচে সাড়ে পাঁচটার সময় অ্যালার্ম দিয়ে আমরা আটটার মধ্যেই সকলে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম।

আমার ঘুমটা ভেঙে গেল একটা বাজের শব্দে। উঠে বুঝতে পারলাম। বাইরে বেশ ঝোড়ো হাওয়া বইছে, আর তার ফলে তাঁবুর কাপড়টা কেঁপে কেঁপে উঠছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর তাঁবুর দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরেটা দিনের মতো আলো হয়ে উঠছে। অথচ এরমধ্যে অবিনাশবাবু দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। ভাবলাম একবার উঠে গিয়ে দেখি কাবালার তাঁবুটা ঠিক আছে কি না।

দরজা ফাঁক করে বাইরে আসতেই ঝড়ের তেজটা বেশ বুঝতে পারলাম। আকাশে চাঁদের বদলে কালো মেঘ প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে।

কাবালার তাঁবুর দিকে চাইতেই একঝলক বিদ্যুতের আলোতে সাদা তাঁবুর সামনে একটি অতিকায় কালো জন্তুকে দেখতে পেলাম। সেটা কাবালার তাঁবুর দিক থেকে আমাদের তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসছে। আমার হাতে টর্চ ছিল, সেটা জন্তুটার দিকে ফেলতেই তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। গেরিলা-কিন্তু ঠিক সাধারণ গেরিলা নয়। সচরাচর একটা বড় সাইজের গেরিলা ছফুটের বেশি লম্বা হয় না। এটার হাইট অন্তত আট ফুটের কম না। মানুষের মতো দুপায়ে হেঁটে সেই আট ফুট লম্বা ও পাঁচ ফুট চওড়া দানবটা এগিয়ে আসছে। আমারই তাঁবুর দিকে।

মনে মনে বললাম-এটাই তো স্বাভাবিক। গ্রেগরিকে ধরে নিয়ে গেছে, এবার তো আমাকেই নেবার পালা! আমিও যে ম্যাসিংহ্যামের অনুসন্ধান করছি, আর আমিও যে বৈজ্ঞানিক-সুতরাং আমার উপর তো তার আক্রোশ হবেই!

অবিশ্যি এত কথা ভাববার আগেই আমি তাঁবুতে ফিরে এসে আমার ব্রহ্মাঙ্গটি বার করে নিয়েছিলাম। সেটা হাতে করে বাইরে বেরোতেই একেবারে গেরিলার মুখোমুখি হয়ে গেলাম। কিছু বুঝতে পারার আগেই জানোয়ারটা একটা লাফ দিয়ে তার বিশাল লোমশ হাতদুটো দিয়ে আমাকে জাপটে ধরল। আমি সেই মুহূর্তেই আমার সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা পিস্তলটা তার বুকের উপর ধরে বোতামটা টিপে দিলাম। একটা তীক্ষ্ণ শিসের মতো শব্দ হল, আর পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে অতিকায় গেরিলাটা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এদিকে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। তাঁবুতে ফিরে আসব, এমন সময় বিদ্যুতের আলোতে দেখি, যেখানে গেরিলাটা ছিল সেখানে মাটিতে একটা চকচকে ধাতুর জিনিস পড়ে আছে। জিনিসটা হাতে নিয়ে তাঁবুতে ঢুকে ল্যাম্পের আলোয় দেখে বুঝলাম সেটা একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্র। এরকম যন্ত্র এর আগে আমি আর কখনও দেখিনি। সকালে এটাকে পরীক্ষা করে দেখব ব্যাপারটা কী। এখন বেজেছে রাত দেড়টা। আপাতত আরেকটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

২৯শে অক্টোবর

ম্যাসিংহাম অনুসন্ধান পর্বের শেষে আমার মনের বর্তমান অবস্থার বর্ণনা দেওয়া ভারী কঠিন। আনন্দ, দুঃখ, আতঙ্ক, অবিশ্বাস-সব মিলিয়ে মনটা কেমন যেন জট পাকিয়ে গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে। এই ভেবে যে ম্যাসিংহামের মতো পণ্ডিত ব্যক্তিরও এই দশা হতে পারে। মানুষের মস্তিষ্কের ব্যাপারটা চিরকালই বোধ হয় জটিল রহস্য থেকে যাবে। ...

গেরিলা-সংহারের পর সাড়ে তিন ঘণ্টা মাত্র ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম ভাঙতে একটু অবাক হয়ে দেখি অবিনাশবাবু আমার আগেই উঠে বসে আছেন। বললেন, ওটা কী রেখেছেন মাথার পাশে-কে কোঁ শব্দ করছে?

সত্যিই তো!-গেরিলার জায়গায় যে ধাতুর জিনিসটা পেয়েছিলাম, সেটা আমার বালিশের পাশেই রাখা ছিল। ঠিক এরকমই একটা জিনিস সেদিন গেরিলাবাহিনীর দলপতির মাথায় লাগানো দেখেছিলাম। এখন দেখি সেই যন্ত্রটার ভিতর থেকে একটা মিহি সাইরেনের মতো শব্দ বেরোচ্ছে। আমি সেটা হাতে তুলে নিলাম। শব্দ থামল না।

জিনিসটা দেখতে একটা ছোট বাটির মতো-মনে হয় ইস্পাত জাতীয় কোনও ধাতুর তৈরি। বাটির দুদিকে দুই কানায় দুটো বাঁকানো পাতের মতো জিনিস রয়েছে। সেটা ফাঁক করে মাথার উপর নামিয়ে দিলে মাথার দুপাশে আটকে যায়। ফলে বাটিটা মাথার উপর উপুড় হয়ে বসে যায়-একেবারে ঠিক ব্রহ্মতালুতে। বাটির ভিতরে দেখলাম ছোট ছোট আশ্চর্য জটিল সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রয়েছে।

অবিনাশবাবু বললেন, ওটা পেলেন কোথায়? কাল রাত্তিরেও তো দেখিনি। এর আগে ওরকম জিনিস কোথায় দেখেচি বলুন তো-কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে!

পরীক্ষার প্রথম ধাপ হিসেবে পাতদুটোকে দুহাতে ধরে ফাঁক করে বাটিটাকে উপর দিকে রেখে যন্ত্রটা ঠিক গেরিলার মতো করে মাথায় পরে ফেললাম, আর পরামাত্র আমার শরীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা শিহরন খেলে গেল।

তারপর আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম তার আগেই আসল যা ঘটনা সব ঘটে গেছে। মিরান্ডা হোটেলের বারান্দায় বসে আমি অবিনাশবাবুর মুখে সে সমস্ত ঘটনা শুনি, আর শুনে অবধি মনে হচ্ছে-ভাগ্যিস অবিনাশবাবু সঙ্গে ছিলেন!

আমার কী হয়েছিল। জিজ্ঞেস করাতে অবিনাশবাবু বলতে শুরু করলেন—

আরে মশাই, আপনি বলছেন। আপনি অজ্ঞান হয়েছিলেন, কিন্তু অজ্ঞান তো কই কিছু বুঝলুম না। যন্ত্রটা মাথায় পরলেন, তারপর তিড়িং করে একটা লাফ দিয়েই বেশ যেন একটা ফুর্তির সঙ্গে তাঁরু থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। আমি ভাবলুম আপনি কিছু পরীক্ষণ টরীক্ষা করতে গেছেন, এক্ষুনি ফিরবেন। ওমা—দশ মিনিট গেল, বিশ মিনিট গেল—কোনও পাত্তাই নেই। আপনার। তখন কেমন যেন একটা সন্দেহ হল। আমিও বাইরে বেরোলুম, এদিক ওদিক দেখলুম, টিলায় উঠলুম-কিন্তু কোথাও আপনার কোনও চিহ্ন দেখতে পেলুম না। অন্য তাঁরুটার কাছে গিয়ে দেখি ওই যে কাফ্রি ছোকরাটা-ক্যাবলা না। কী নাম—সে তাঁরুর পাশে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে চেয়ে কী জানি দেখছে। আমায় দেখেই বললে, গেরিলা এসেছিল রাত্রে। প্রোফেসর ঠিক আছেন তো?

আমি বললুম, প্রোফেসর উইথ সাইনিং হেডক্যাপ গো আউট হাফ-অ্যান-আওয়ার।

শুনে সে ভারী ব্যস্ত হয়ে বললে, আমাদের এক্ষুনি বেরোতে হবে। মাটিতে নিশ্চয়ই প্রোফেসরের পায়ের ছাপা পড়েছে। সেই ছাপ আমাদের ফলো করতে হবে।

ভাবলুম জিজ্ঞেস করি সে কীসের আশঙ্কা করছে, কিন্তু ইংরিজি মাথায় এল না, তাই চুপ করে গেলুম।

দশ মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লুম। তাঁবুর বাইরে থেকেই পায়ের ছাপ শুরু হয়েছে—সেই ধরে এগিয়ে চললুম। কিন্তু আশ্চর্য কী জানেন? সেই ছাপ কোথায় গিয়ে মিশেছে জানেন? সেদিনের পাঁচশো গেরিলার পায়ের ছাপের সঙ্গে। সেগুলো যদিকে গেছে, আপনিও সেদিকেই গেছেন। দেখে কী মনের অবস্থা হয় বলুন তো? তবে আপনার ছাপটা টাটকা বলে সেটা আরও স্পষ্ট, তাই পথ হারাইনি কোথাও।

দুপুর নাগাদ হাঁটতে হাঁটতে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছেলুম। যেখানে জঙ্গলটা ঘন হয়ে গিয়ে প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড বড় বড় গাছ—একটারও নাম জানি না, আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার—একটি শব্দ নেই। পাখি জানোয়ার ব্যাঙ ঝিঝি কাক চড়ুই তক্ষক কিছু না। এমন থমথমে বন এক স্বপ্নেই দেখিচি। ঠিক মনে হয় যেন মড়ক লেগে সব কিছু মরেটরে ভূত হয়ে গেছে।

তবে তারমধ্যেও দেখলুম। আপনার পায়ের ছাপ ঠিকই রয়েছে; আর দেখলে মনে হয়—অন্তত ক্যাবলা তাই বললে—যে আপনি যেন যাকে বলে দৃষ্ট পদক্ষেপেই এগিয়ে চলেছেন।

আরও দশ মিনিট চলার পরেই কী সব যেন শব্দ কানে আসতে লাগল—দুমদাম ধূপ ধাপ খচখচ—নানারকম শব্দ। ক্যাবলা দেখি তার বন্দুকটাকে বাগিয়ে ধরেছে। আমার কিছুই ধরার নেই—এমনকী লাঠিখানাও ছাই তাঁবুতে ফেলে এসেছি—তাই ক্যাবলার কাঁধখানাই খাবলে ধরলুম।

কিছুটা পথ চলার পর এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলুম, আর সেই সঙ্গে শব্দের কারণও বুঝতে পারলুম। আমার তো এমনিতে মৃত্যুভয় নেই, কারণ জানি সেভেনটি এইটের আগে মরব না, কিন্তু তাও যা দেখলুম। তাতে গলা শুকিয়ে রক্ত জল হয়ে গেল।

দেখি কী-বনের মধ্যখানে একটা খোলা জায়গা। আগে খোলা ছিল না—আশেপাশের সব গাছফাছ কেটে জায়গাটাকে পরিষ্কার করা হয়েছে। সেই খোলা জায়গার মধ্যখানে রয়েছে। কাঠের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কাঠের তৈরি একটা বেশ বড় রকমের বাড়ি। পাঁচিলের

মধ্যখানে আমরা যেদিক দিয়ে আসছি সেদিকে রয়েছে একটা ফটক। আর সেই ফটক আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক প্রহরী। কিন্তু সে প্রহরী মানুষ নয়, সে এক সাক্ষাৎ দানবতুল্য গেরিলা। আমাদেরই দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা, অথচ দেখে মনে হয় সেটা যেন আমাদের দেখতেই পাচ্ছে না।

ফটকের ফাঁক দিয়ে ভেতরের কম্পাউন্ডটা দেখা যাচ্ছিল; সেখানে দেখি-কী অন্তত পক্ষে শদুয়েক গেরিলা। তাদের কেউ টহল ফিরছে, কেউ মোট বইছে, কেউ কাঠ কাটছে, আর আরও কত কী যে করছে যা বাইরে থেকে ভাল বোঝাও যায় না।

আপনার পায়ের ছাপ বলছে যে আপনি সটান ওই ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছেন। কোথায় গেছেন, বেঁচে আছেন কি মরে গেছেন, তা মা গঙ্গাই জানেন। আমি তো কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কিন্তু ক্যাবলা দেখলুম। আদপেই ঘাবড়ায়নি। বললে, ভেতরে যাওয়া দরকার, কিন্তু বুঝতেই পারছি—ফটক দিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ, আর বন্দুকটা থেকেও না থাকার সামিল।

আমি বললুম, দেন হোয়াট ইউ ডুইং? ক্যা

বলা, উত্তর দিলে না। সে মাথা তুলে এদিক ওদিক গাছের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। তারপর একটা প্রায় মনুমেন্টের মতো গাছের উপরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ওই যে দেখছ ঝুলন্ত লতাটা গাছের ডালের সঙ্গে পাকিয়ে রয়েছে, মনে হচ্ছে ওইটের প্যাঁচ খুলে ঝুলে পড়লে ওই কাঠের বাড়ির চালে পৌঁছানো যাবে।

আমি বললুম, হু গো?

ক্যাবলা বললে, আমি তো যাবই, কিন্তু তুমি বাইরে একা থেকে কী করবে? আর তোমার বন্ধু তো ভিতরে। আমার মতে দুজনেরই যাওয়া উচিত।

বললুম, বাট গেরিলা?

ক্যাবলা বললে, আমার ধারণা গেরিলারা ম্যাসিংহামের আদেশ ছাড়া কিছু করবে না। ম্যাসিংহাম কিছু জানতে না পারলেই হল। চলো—সময় বেশি নেই—আর গ্রেগরি শঙ্কু দুজনেই বিপন্ন।

বলব কী মশাই-ছেলেবেলায় টাজনের বই দেখে কত আমোদ হয়েছে, কিন্তু সেই আফ্রিকার জঙ্গলে এসে কোনওদিন যে আবার আমাকেই টাজনের ভূমিকা নিতে হবে সে তো আর কস্মিনকালেও ভাবতে পারিনি।

ক্যাবলা দেখলুম চোখের নিমেষে ওই রামঢ্যাঙা গাছটা বেয়ে তরতরিয়ে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাত উপরে উঠে গেল। তারপর লতাটার নাগাল পেয়ে সেটার প্যাঁচ খুলতে শুরু করল। খোলা হলে পর সেটা ছেড়ে দিতেই সেটা মাটিতে পৌঁছে গেল। ক্যাবলা প্রথমে সেই লতা বেয়ে মাটিতে নেমে চোখের একটা আন্দাজ করে নিলে। তারপর লতার মুখটা হাতে ধরে গুড়ি বেয়ে গাছের আরেকটা ডালে গিয়ে উঠলে। সেখান থেকে সে আমায় ইশারা করে বুঝিয়ে দিলে যে সে লতাটা ধরে ঝুলে পড়ে দোল খেয়ে কাঠের বাড়ির ছাতে গিয়ে নামছে; নেমেই সে লতাটাকে আবার ছেড়ে দিয়ে আমার দিকে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। আমি যেন ঠিক সেই ভাবেই দোল খেয়ে চলে যাই; একবার সেখানে পৌঁছেলে সে নিজেই আমাকে ধরে নামিয়ে নেবে।

আমি ইষ্টনাম জপ করতে শুরু করলুম। আপত্তির সব কারণগুলো বলতে হলে অনেক ইংরেজি বলতে হয়, আবার যদি শুধু নে বলি তো ভাববে। কাওয়ার্ড—তাতে বাঙালির বদনাম হয়। তাই চোখ বুজে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে বলে দিলুম—ইয়েস, ভেরি গুড।

তিন মিনিটের মধ্যে টাজনের খেল দেখিয়ে ক্যাবলা কাঠের বাড়ির ছাদে পৌঁছে গেল। তারপর লতাটাকে ছেড়ে দিতেই সেটা আবার সাঁই করে দুলে ফিরে এল, আর আমিও সেটাকে খপ করে ধরে নিয়ে গাছে চড়তে শুরু করলুম। কীভাবে চড়িচি সে আর বলে কাজ নেই; হাঁটুর আর কনুইয়ের অবস্থা তো আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন।

ডালের উপর পৌঁছে লতোটাকে নিজের কোমরের চারপাশটায় বেশ করে পেঁচিয়ে নিলুম। তারপর দুগগা বলে চোখ কান বুজে, ডাল থেকে দিলুম ঝাঁপ। একটা যেন প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া, আর তার সঙ্গে কানের মধ্যে সনসন, পেটের মধ্যে গুড়গুড়, আর হাত পা যেন ঝিমঝিম—কিন্তু পরীক্ষণেই দেখলুম। আমি একেবারে ক্যাবলার খপ্পরে। সে আমাকে জাপটে ধরে আমার কোমর থেকে লতার প্যাঁচ খুলে দিলে, আর আমিও হাঁপ ছাড়লুম। ঠাকুরমার দেওয়া অবিনাশ নামটা যে কত সার্থক সেটাও তখনই বুঝলুম।

এবার ক্যাবলা ইশারা করে ছাদের মধ্যখানে একটা উচু মতো চৌখুপির দিকে দেখালে। বুঝলুম সেটা একটা স্কাইলাইট-যেমন আমাদের গিরিডিতে রাইটসাহেবের বাংলোর উপরে রয়েছে। এবার দুজনে হামাগুড়ি দিয়ে সেই স্কাইলাইটের কাছে গিয়ে তার দুটো জানালার মধ্যে দিয়ে মাথা গলিয়ে দিলুম। যা দেখলুম। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার।

যে ঘরটা দেখা গেল সেটা মাঝের ঘর—আর মনে হল বেশ বড়। যে অংশটা দেখলুম। তাতে একটা বেশ বড় কাঠের টেবিল রাখা রয়েছে। সেই টেবিলের উপর আপনি আর গ্রেগরি সাহেব চিত হয়ে শুয়ে আছেন—দুজনেরই মাথায় আটকানো সেই চকচকে বাটি। আপনাদের দুজনেরই চোখ খোলা, আর সেই চোখ স্কাইলাইটের দিকেই চাওয়া—কিন্তু সে চোখে কোনও দৃষ্টি নেই, একেবারে কাচের চোখের মতো চোখ।

টেবিলের পাশে একটি সাহেব পায়চারি করছেন আর কথা বলছেন। উপর থেকে সাহেবের মাথার টাক আর তার পিছন দিকের লম্বা চুলটাই দেখতে পাচ্ছিলুম, কিন্তু গেরিলাদের দাপাদাপির জন্য তার একটি কথাও শুনতে পাচ্ছিলুম না।

ক্যাবলা বললে, চলো, নীচে নেমে বাড়ির ভেতরে ঢোকার একটা রাস্তা করা যাক।

ছোকরা ভারী তৎপর—যেমন কথা তেমনি কাজ। ছাতের পাশ দিয়ে একটা কাঠের খুঁটি ধরে ঠিক বাঁদরের মতো নিঃশব্দে নীচে নেমে গেল। তারপর দেখি হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমায়—আমাকেও নাকি ওই ভাবেই নামতে হবে। ভাবুন তো এই বয়সে এসব ডানপিটোমো কি চলে! ছোকরা বোধ হয় আমার কিন্তু কিন্তু ভাব বুঝতে পারলে। সে

ইশারায় বোঝালে—তুমি লাফ মারো, আমি তোমায় ধরব। চোখ বুজে। মারলুম। লাফ। বললে বিশ্বাস করবেন না—ক্যাবলা আমায় ঠিক ফুটবলের মতো লুফে নিলে। কী শক্তি ভারুন তো!

বাড়ির যেদিকটায় নামলুম সেটা হল পেছন দিক। একটা খোলা জানোলা ছিল মাটি থেকে হাতচারেক উচুতে। সেটা বেয়ে সাবধানে ভেতরে ঢুকলুম। এ ঘরটা ছোট, বোধ হয় ভাঁড়ারঘর। কাঠের তাক রয়েছে, তাতে টিনের কৌটোতে খাবারটাবার রয়েছে। সামনে ক্যাবলা, আমি ঠিক তার পিছনে পা টিপে টিপে একটা দরজা দিয়ে আরেকটা ঘরে ঢুকলুম। আসতেই তার পাশের ঘর থেকে সাহেবের গলা পেলুম। মনে হল সাহেবের বেশ উল্লাস হয়েছে। ভেজানো দরজার চেরা ফাঁকে চোখ লাগিয়ে বুঝলুম এটাই সেই মাঝের বড় ঘর যাতে আপনারা দুজনে বন্দি হয়ে রয়েছেন। ম্যাসিংহ্যামসাহেব কথা বলে চলেছেন, আর মাঝে মাঝে অউহাসি করে উঠছেন। তার কথা শুনে মেটমাট যা বুঝলুম তা হচ্ছে এই—

ম্যাসিংহ্যামের তৈরি ওই বৈদ্যুতিক বাটির গুণ হল এই যে, মানুষ বা মানুষের পূর্বপুরুষ বাঁদর জাতীয় যে কোনও প্রাণী ওই বাটিটি মাথায় পরলেই তাকে ম্যাসিংহ্যামের বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। প্রথমে একটি গেরিলাকে ম্যাসিংহ্যাম। এইভাবে বশ করে। তারপর সেই গেরিলার সাহায্যে অন্য গেরিলাদের দলে টানে। এই গেরিলাগুলো হয়ে পড়ে তার বিশ্বস্ত চাকর। শুধু চাকর নয়—তার সৈন্য এবং তার বডিগার্ডও বটে। গ্রেগরি সাহেব তাঁর কাজের ব্যাঘাত করছিলেন বলে তিনি গেরিলার সাহায্যে তাঁকে পাকড়াও করেন, এবং মাথায় বাটি পরিয়ে তাকে বশ করেন। আর আপনি তো নিজে থেকেই বিশ হয়ে তাঁর কাছে গেছেন। ম্যাসিংহ্যাম আপনাদের মতো দুজন সেরা বৈজ্ঞানিককে হাত করে গেরিলাবাহিনীর সাহায্যে বৈজ্ঞানিক জগতের একেবারে একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসবেন ভাবছিলেন। আপনারা তিনজনে কাজ চালিয়ে যাবেন, এবং যদি বাইরের লোক কেউ নাক গলাতে আসে, তা হলে গেরিলা লেলিয়ে দিয়ে তার দফারফা করা হবে।

ম্যাসিংহামের প্রলাপ শুনে আমরা একেবারে হকচাকিয়ে গেলুম। ক্যাবলা রাগে ফুলতে ফুলতে বললে, আড়ি পেতে কোনও লাভ নেই। চলো ঘরের ভিতর ঢুকি।

আমি কিন্তু আরেকটা জিনিস লক্ষ করেছিলুম। যেটা ক্যাবলার চোখে পড়েনি। আমাদের ডানদিকে একটা দরজা রয়েছে, তার মধ্যে দিয়ে আরেকটা ঘর দেখা যাচ্ছে। আমি দরজাটার দিকে গিয়ে সেটা ফাঁক করতেই ভিতরের সব যন্ত্রপাতি চোখে পড়ল। বুঝতে পারছিলুম, আমার সাহস ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দরজাটার মুখে দাঁড়িয়ে ক্যাবলাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলুম। তারপর দরজাটা আরও খানিকটা ফাঁক করলুম। বুঝলুম সেটাই যাকে বলে কন্ট্রোলরুম! দেয়ালের গায়ে কাঠের তক্তার উপর নানারকম বোতাম হ্যান্ডেল সুইচ ইত্যাদি রয়েছে, আর প্রত্যেকটার উপর ইংরিজিতে লেখা রয়েছে কোনটা কী কাজ করে। বুঝলুম এখান থেকেই বোতাম টিপে, মানুষ গেরিলা ইত্যাদি যে কেউ ম্যাসিংহামের বশ, তাদের সবাইকেই চালানো যায়। সেদিন যে বাটির ভিতর থেকে শব্দ বেরোচ্ছিল, তাও সে এখান থেকে বোতাম টেপার জন্যই।

ক্যাবলা দেখি এগিয়ে এসে দরজাটা আরও খানিকটা ফাঁক করলে। তারপর আমার দিকে ফিরে ফিসফিস করে বললে-ভেতরে এসো।

ঢুকতে যাব।—কিন্তু বাধা পড়ল। ক্যাবলা পিছিয়ে বাইরে চলে এল। একটু গলা বাড়তেই দেখি দরজার ঠিক পাশেই একটা বিশাল কালো লোমশ পিঠ দেখা যাচ্ছে। বুঝলুম কন্ট্রোলরুম পাহারা দেবার জন্যেও একটি গেরিলা প্রহরী রাখা হয়েছে।

এবারে বোর্ডের একটি লেখা চোখে পড়ল—মাস্টার কন্ট্রোল। লেখার নীচে দুটি সুইচ। একটিতে লেখা অন, আর একটিতে অফ। অন সুইচে এখন বাতি জ্বলে রয়েছে। বুঝলুম অন্যটি যদি টেপা যায়, তা হলে সব বৈদ্যুতিক কাজ বন্ধ হয়ে যাবে—গেরিলাগুলো আবার স্বাধীন হয়ে যাবে, আর আপনারাও দুজনে জ্ঞান ফিরে পাবেন। কিন্তু সুইচ টিপব কী করে? ওই কালিদানবের দৃষ্টি এড়ানো যে অসম্ভব। আর শুধু তাই নয়—গেরিলাগুলো স্বাধীন ও

স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলে আবার কী করে বসে তাও তো বলা যায় না। তারা যদি এসে আমাদের আক্রমণ করে তখন কী হবে?

হঠাৎ খেয়াল হল যে পাশের বড় ঘর থেকে আর ম্যাসিংহ্যামের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না। ব্যাপার কী?

আবার সেই ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম। এবার উঁকি মেরে দেখি ম্যাসিংহ্যাম আমাদের দিকে পিঠ করে টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে আছে। একটা ধূপ ধূপ করে শব্দ হল। দেখি একটা গেরিলা একটা প্লেটে করে মাংসজাতীয় কী একটা খাবার এনে ম্যাসিংহ্যামের সামনে রাখলে। স্পষ্ট শুনলুম সাহেব বললে থ্যাঙ্ক ইউ। গেরিলাটা যেদিক দিয়ে এসেছিল আবার সেই দিকেই চলে গেল।

সবে ভাবছি। এ অবস্থায় কী করা উচিত, এমন সময় ক্যাবলা চক্ষের নিমেষে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল।! বিদ্যুৎবেগে দরজাটা খুলে এক লাফে ম্যাসিংহ্যামের পিছনে পৌঁছে ধাঁ করে পকেট থেকে একটা সবুজ রুমাল বার করে সাহেবের মুখটা বেঁধে দিয়ে তার চিৎকারের পথটা বন্ধ করে দিলে। তারপর তাকে জাপটে ধরে চেয়ার থেকে কোলপাঁজা করে তুলে একেবারে আমাদের ঘরে নিয়ে এল।

এবার সাহেবের মুখ দেখলুম। ঘন পাকা ভুরুর নীচে নীল চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। অসহায় অবস্থায় পড়ে সেই চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটছে। বুদ্ধি থাকতে পারে সাহেবের, কিন্তু গায়ের জোরে ক্যাবলার কাছে সে একেবারে নেংটিইঁদুর।

এবার ক্যাবলা সাহেবকে কষ্ট্রোলরুমের সামনে নিয়ে এসে ফিসফিস করে বললে, সুইচ টেপো। বলেই কষ্ট্রোলরুমের দরজা পা দিয়ে ঠেলে খুলে দিলে। কালিদানব দাঁড়িয়ে আছে—এমন বীভৎস, ভয়াবহ জানোয়ার জীবনে দেখিনি মশাই। আমাদের পুরাণের অসুর বোধ হয় ওই জাতীয়ই একটা কিছু ছিল। অবাক হয়ে দেখলুম—গেরিলাটা ম্যাসিংহ্যামকে ওইরকম বন্দি অবস্থায় দেখেও আর কিছু না করে কেবল একটা কুর্নিশ করলে।

ক্যাবলা আবার বললে, সুইচ টেপো।

ম্যাসিংহ্যাম ক্যাবলার দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে প্রশ্ন বোঝালে—কোন সুইচ?

ক্যাবলা চাপা গম্ভীর স্বরে বললে—দ্য সুইচ টু সেভ দেম ব্যাক।

ম্যাসিংহ্যামের অবস্থা তখন এমন শোচনীয় যে নৃশংস উন্মাদ হওয়া সত্ত্বেও তখন তার জন্যে একটু মায়া হচ্ছিল।

ক্যাবলা সাহেবের ডান হাতটা একটু আলাগা করে দিয়ে তাকে সুইচবোর্ডের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। সাহেব কাঁপতে কাঁপতে একটা হলদে রঙের বোতাম তার ডান হাতের তর্জনী দিয়ে টিপে দিলে, আর দিয়েই, কেমন জানি অসহায় ভাবে ক্যাবলার বুকের উপর চিত হয়ে পড়লে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে ম্যাজিকের মতো বাইরের দুপদীপ শব্দ সব একসঙ্গে থেমে গিয়ে একটা অস্বাভাবিক থমথমে ভাবের সৃষ্টি হল। পাশে চেয়ে দেখি অতিকায় দানবের চোখের দৃষ্টি একেবারে বদলে গেছে। সে এদিক ওদিক চাইছে—নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে।

এদিকে ক্যাবলা। কিন্তু তখনও ম্যাসিংহ্যামকে জাপটে ধরে আছে, আর ম্যাসিংহ্যামের দৃষ্টি রয়েছে গেরিলা দিকে। ক্যাবলা আমায় ফিসফিস করে বললে, কাঁধ থেকে আমার বন্দুকটাও নাও—নিয়ে পিছিয়ে গিয়ে গেরিলাটার দিকে তাগ করে থাকো—ইফ হি ডাজ এনিথিং, প্রেস দ্য ট্রিগার!

সার্কাসের খেলাই যখন দেখালুম, তখন শিকারির খেলা দেখাতে আর কী? গভীরভাবে ক্যাবলার হাত থেকে বন্দুকটা খুলে নিয়ে দশ হাত পিছিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর বন্দুকটা উঁচিয়ে গেরিলাটার দিকে তাগ করলুম।

জন্তুটা প্রথমে কন্ট্রোলরুম থেকে বেরিয়ে এল। তারপর এদিকে ওদিকে চেয়ে মুখ দিয়ে একটা ঘরঘর শব্দ করে দাঁত খিচিয়ে দুহাত দিয়ে তার নিজের বুকের উপর দুমদুম

করে কয়েকটা কিল মারল। তারপর-আশ্চর্য ব্যাপার-কাউকে কিছু না বলে চার পায়ে ভর করে নিঃশব্দে দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে চলে গেল।

এবার বড় ঘরে গেলুম। আপনারা দুজনে তখনও যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব করে টেবিলের উপর শুয়ে আছেন। একটা প্রচণ্ড দাপাদাপির শব্দ পেয়ে বাঁদিকে ঘুরে জানালা দিয়ে দেখি বাইরে এক অদ্ভুত কাণ্ড চলেছে। কতগুলো গেরিলা জানি না-অন্তত শ পাঁচেক তো হবেই-সবকটা একসঙ্গে নিজেদের বুকো কিল মারছে। দুমদুম ধুপ ধুপ দুমদুম-হাজার দুরমুশের শব্দে কান পাতা যায় না।

তারপর ক্রমে শব্দ থেমে এল, আর দেখলুম কী-সব কটা গেরিলা একসঙ্গে পূর্বমুখো হয়ে কম্পাউন্ডের গেটের দিকে চলতে শুরু করল। আপনার ও গ্রেগরিসাহেবের মাথা থেকে যন্ত্রদুটো যখন খুলছি, ততক্ষণে গেরিলাদের পায়ের শব্দ প্রায় মিলিয়ে এসেছে।

তার পরের ঘটনা আর কী বলব। ম্যাসিংহ্যাম সাহেবকে যে পাগলাগারদে রাখা হয়েছে সে খবর তো জানেন। আর গেরিলাদের হাতের তৈরি তার কাঠের বাড়িটিকে যে যন্ত্রপাতি সমেত পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলা হয়েছে তাও জানেন। এখন শুধু এইটেই বলার আছে যে, ভবিষ্যতে কোথাও কোনও হ্যাঙ্গামের কাজে যেতে হলে আমাকে বাদ দিয়ে যাওয়াটা নিরাপদ হবে কি না, সেটা ভেবে দেখবেন!

সন্দেশ। শারদীয়া ১৩৭৬